ঝড়ের পূর্বাভাস:

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য
বিকল্প পথ

উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ

ঝড়ের পূর্বাভাস:

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিকল্প পথ

শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

- **প্রথম প্রকাশ**

  রবিউস সানী, ১৪৪৪ হিজরী

  অক্টোবর, ২০২২ ইংরেজি

- **দ্বিতীয় প্রকাশ**

  জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী

  জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি

- **প্রকাশক**

  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org

  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org

  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org

  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1

  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org

  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

- **মূল্য**

  বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সূচিপত্র

ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ'র 'ঝড়ের পূর্বাভাস: বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিকল্প পথ' গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিকল্প পথগুলো সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা পাব ইনশাআল্লাহ। এই প্রবন্ধটি এই বিষয়ক পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সাথে সম্পৃক্ত, যা 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর বিগত মে-জুন সংখ্যায় 'গভীর সঙ্কটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হলো- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক

১ই রবিউস সানী, ১৪৪৪ হিজরী

২৭ই অক্টোবর, ২০২২ ইংরেজি

আমরা পূর্বেও বলেছিলাম যে, বর্তমানে বাংলাদেশ একটি ঐতিহাসিক দ্বিমুখী অবস্থানে (দোটানার মধ্যে) আছে। তার দিগন্তে ঝড়ের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই নিজের জন্য কোনো একটি পথ নির্ধারণ করার সময় এসে গেছে। এমন একটি রাস্তা যা এই দেশবাসীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু সেই রাস্তা নির্ধারণ কে করবে? এটা উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আন্দোলনগুলোর নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব।

আমি এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আরও কিছু দিক স্পষ্ট করবো। অতঃপর আমার চেষ্টা থাকবে বাংলাদেশের উপর একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ পেশ করার। যা আগত দিনগুলোর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনগুলোর নেতৃবৃন্দের জন্য সহযোগী ও উপকারী সাব্যস্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

এই প্রবন্ধটি এই বিষয়ক পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সাথে সম্পৃক্ত, যা ‘নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ’ এর বিগত মে-জুন সংখ্যায় ‘গভীর সঙ্কটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ[1]’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের নিকট নিবেদন; তারা যেন এই বিষয়ক ‘গভীর সঙ্কটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ’ নামক পূর্বের প্রবন্ধটি পড়ে নেন।

---

[1] ‘জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা’র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন ‘নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ’ এর গত মে-জুলাই ২০২২ ইংরেজি সংখ্যায় “বাংলাদেশ এক দাওরাহে পর!” (بنگلہ دیش ایک دوراہے پر!) শিরোনামে আগের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আল হিকমাহ মিডিয়া থেকে এর বাংলা অনুবাদ ‘গভীর সঙ্কটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

লিঙ্ক - http://gazwah.net/?p=40948

বর্তমানে বাংলাদেশ সমস্যা ও সঙ্কটের এমন এক ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যার তীব্রতা ও প্রকটতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি এমন এক সমস্যা এবং এর সাথে এমন কিছু কারণ জড়িয়ে আছে যার নিকটতম ভবিষ্যতে কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না। যদিও এটা সম্ভব যে, অবস্থা বেধে সময় ও পরিস্থিতির সাথে সাথে সংকটের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে দেখা যাবে।

অর্থনৈতিক সমস্যাবলী:

বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি সমস্যা হচ্ছে এর অর্থনৈতিক সমস্যা। দেশের অর্থনীতি সংকটের মধ্যে রয়েছে। এটি এমন একটি সংকট যা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি রেকর্ড সীমায় পৌঁছে গেছে। কিছু সূত্র বলছে যে, ২০২২ সালের আগস্টে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের চেয়ে বেশি ছিলো। চলতি বছরের শুরুতে এক ডলার ছিলো ৮৫.৮০ টাকা। এখন সেপ্টেম্বরে এটি ১০৬.৭৫ টাকার সমান। এর মানে হচ্ছে বাংলাদেশি মুদ্রা এক বছরে ২৩.২৫ শতাংশ মান হারিয়েছে।

খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বেড়ে চলেছে। এমনকি সাবান, শ্যাম্পু এবং ডিটারজেন্টের মতো সাধারণ জিনিসের দামও গত দুই মাসে ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। চারদিক থেকে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। একদিকে জিনিসের দাম বাড়ছে অন্যদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, নিকট ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরও

অবনতি হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, তিন ধরনের সংকটে পড়তে পারে দেশ।

প্রথমত, খাদ্য আমদানিতে অতিরিক্ত ডলারের প্রয়োজন হতে পারে, যা ঐ পণ্যগুলোর দাম আরও বাড়িয়ে দিবে। এমনকি দাম্ভিক, অহঙ্কারী হাসিনাও এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, এমন একটা সময় আসতে পারে যখন মানুষের প্রয়োজনীয় খাবার থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, রপ্তানির দৃষ্টিকোণ থেকে; এই পণ্যগুলি তৈরির জন্য উৎপাদন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ইতিমধ্যে হ্রাস পেয়েছে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই পণ্যগুলি রপ্তানি করা হয়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সেখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, ফলে অনেক রপ্তানি আদেশ বাতিল হয়েছে। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা এবং রপ্তানি থেকে আয় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় মুদ্রা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এর সাথে সাথে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, আবশ্যকীয়ভাবে বৈদেশিক ঋণও দ্রুত বাড়ছে। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় হারের সংকট তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আগামীতে আরও চাপের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশ।

চতুর্থ ও শেষ কথা হলো, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ব্যাপক দুর্নীতির কারণে দেশের অধিকাংশ ব্যাংক ফাঁপা হয়ে গেছে। এসব কারণ এবং আগামী বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয় ছাড়া আর কোথায় নিয়ে যাবে?

সীমান্ত অসুবিধা:

বাংলাদেশের সামনে আরেকটি গুরুতর এবং জটিল সমস্যা হলো - সীমান্তে ভারত এবং এখন মিয়ানমারের আগ্রাসন বৃদ্ধি পাওয়া। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা প্রায়ই বাংলাদেশের বেসামরিক মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে থাকে। এখন মিয়ানমারও ভারতের অনুকরণ করছে। আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে একাধিকবার ফায়ারিং করেছে মিয়ানমার। এসব হামলার মধ্যে রয়েছে বোমাবর্ষণ, ফাইটার জেট (যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টার) দ্বারা বোমাবর্ষণ এবং মাইন আক্রমণ।

এসব হামলায় অন্তত একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মিয়ানমার সরকার দাবি করে যে, আরাকান আর্মি[2] এবং আরসা[3] এর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘাঁটি রয়েছে। মিয়ানমার চায় বাংলাদেশ তাদের তদন্ত করে নির্মূল করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত অজনপ্রিয়, এমনকি কুখ্যাত। আর সরকারি মদদে সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতার কারণে তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই সরকার ও সশস্ত্র

---

[2] বর্মীজদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র মিলিশিয়া। রাখাইন নৃগোষ্ঠীর (আরাকানি) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন। এরা বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে নিজেদের অভয়রাজ্য গড়ে তুলেছে বলেও ধারণা করা হয়।

[3] আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (ARSA) রোহিঙ্গা মুসলিমদের একটি সশস্ত্র দল। পুরনো নাম হারাকাহ আল ইয়াকিন।

বাহিনী - উভয়েরই এই সমস্যাগুলোর মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও নেই, আগ্রহও নেই।

মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ যতই তীব্র হবে, বাংলাদেশ সীমান্তে এই ক্র্যাকডাউনের সংখ্যা ও তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পাবে। এর চেয়েও উদ্বেগজনক বিষয় হলো - চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র মিলিশিয়াদের উপস্থিতি। সীমান্তের এপারে অনেক জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে। এই দলগুলোর একটাই লক্ষ্য: বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই দলগুলো আঞ্চলিক পরিস্থিতি অর্থাৎ মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ, বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক দুর্বলতা এবং চীন ও ভারতের মধ্যকার শীতল যুদ্ধকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে।

মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড / বহু-মেরু বিশ্ব:

একটি বহু-মেরু বিশ্ব আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, বিশ্ব একটি সংক্ষিপ্ত বহু-মেরু বিশ্ব দেখেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময়ে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি ছিলো এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো দৃশ্যত আর কেউ ছিলো না। কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে মুজাহিদরা আমেরিকাকে তার নিজের মাটিতে এমনভাবে আঘাত করেছে যে, তার নিরাপত্তাবোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব থেকে চলে আসা গোপন যুদ্ধকে প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে।

এ ঘটনার পর ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ নামে যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বিজয় আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরাক ও আফগানিস্তান দুই জায়গাতেই আমেরিকাকে অপদস্থ করেছেন। দুই দশকের যুদ্ধের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার দৃষ্টি এবং মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সক্ষমতা তৈরি করতেই এই বিশ বছর ব্যয় করেছে। আর এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ ইউক্রেনে রাশিয়ার সাথে প্রক্সি যুদ্ধে আবদ্ধ। অন্যদিকে আমেরিকা ও চীনের মাঝেও শীতল যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা এবং চীন উভয়ই তাদের শত্রুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য বঙ্গোপসাগরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এদের সাথে ভারতকেও যোগ করুন, যে গোলাম হাসিনার সাহায্য ও সহযোগিতায় কার্যত বাংলাদেশকে একটি প্রদেশ বানিয়ে রেখেছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত - তিনটিরই বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে স্বার্থগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং অনুরূপ। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো একে অপরের বিপরীত। একটি যোগ্য, মেধাবী এবং শক্তিশালী সরকার হয়তোবা একে অপরের বিরুদ্ধ এই শক্তিগুলিকে ব্যবহার করে

সুবিধা লাভ করতে পারতো। কিন্তু হাসিনার তা করার মতো না আছে বুদ্ধি, না আছে ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর না আছে জনসমর্থন। কাজেই আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্বার্থ আরও অস্থিতিশীল না হলে বাংলাদেশের জন্য কোনও লাভ নেই।

হিন্দুত্ববাদ:

ভারতের আরএসএস-এর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন সারা বাংলাদেশে জাল বিস্তার করেছে। হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন 'ইসকন' (হরি কৃষ্ণ আন্দোলন) এর মতো সংগঠনগুলোকে নিয়োগ ও অন্যান্য সাংগঠনিক উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করে। এই আন্দোলন সরকারী প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী এবং মিডিয়ার শিরায় গেঁথে গেছে। এরা এখন একটি দেশপ্রেম বিরোধী, ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর রূপ নিয়েছে, যা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন পূরণের জন্য সংগঠিত ও সক্রিয়।

রাজনৈতিক দৃশ্যপট:

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির আধিপত্য রয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সশস্ত্র এবং হিংসাত্মক রূপ, যা কলকাতায় উদ্ভাবিত বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত[4]। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার প্রধান বিরোধী

[4] ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে

দল বিএনপি-ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর একটি। এই সব দল মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও সবাই আওয়ামী লীগের মতো হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক নয়।

আমেরিকান ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ফরাসি (ইউরোপীয়) ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এই দুটি দলের মধ্যেও উপ-পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মূলগত ভাবে এগুলো একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব (মতাদর্শ)।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই দলগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক দশক ধরে মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাব্যবস্থার ব্রেইন ওয়াশের কারণে মানুষ আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনকে শুধু নির্বাচনী পদ্ধতিতে পরিবর্তন বলেই জানে এবং বুঝে। তারা যখন তাদের ভূমির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কাঠামোর সীমানার ভিতরেই চিন্তা করে।

বর্তমানে হাসিনা ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নয়। ভারতও তাকে আপাতত শাসক হিসেবে রাখতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। সর্বোপরি সে নিজেকে একজন বাধ্য পোষা প্রাণী হিসেবে প্রমাণ করেছে। এসব

বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত ও বিত্তশালীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বুদ্ধিজীবী মহলে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য থাকায় নবসৃষ্ট এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুতেই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না।

বাংলার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, তাদের কর্ণধারেরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিদার হিসেবে যত কথাই বলে থাকুক না কেন, তা আসলে বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথাবার্তা। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী - এম আর আখতার মুকুল – পৃষ্ঠা ৩১)

নিদর্শন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ কোনও না কোনওভাবে নির্বাচনী ফলাফল হাইজ্যাক করে হলেও ক্ষমতায় নিজেদের দখল অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবে।

তবে বিরোধীরা হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করতে চাইলে তাদেরকে অনিবার্যভাবে রাজপথে নামতে হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সবসময়ই রাজপথে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং আগ্রাসন প্রয়োজন হয়। আমরা অনেকবার এটা দেখেছি। **১৯৯০, ১৯৯৬** এবং **২০০৭** সালে দীর্ঘ ধারাবাহিক বিক্ষোভ, মিছিল এবং রাস্তায় সহিংস ঘটনার পর সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন তখনকার সরকারের সমর্থন ত্যাগ করেছিল। এর ফলে সরকারের পতন হয়েছিল।

কিন্তু হাসিনার বিরোধীদের রাজপথের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়ার সাধ্য নেই। এভাবে সেনাবাহিনী দিয়েও তারা হাসিনাকে উৎখাত করতে পারবে না। তারা যদি হাসিনাকে বলপ্রয়োগ করে অপসারণ করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামী সংগঠনগুলো এবং সামরিক সংস্থার সমর্থন প্রয়োজন হবে।

আওয়ামী লীগের বিপরীতে, বিরোধী শিবিরের বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও গভীর নেটওয়ার্ক নেই। তাই তাদের নির্ভর করতে হয় ইসলামী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল (যেমন জামায়াত-ই-ইসলামী) এবং মাদরাসার ছাত্রদের উপর। গত ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক পদ্ধতি এটাই হয়ে আসছে। যখনই সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের

কথা আসে, তখনই বড় বড় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো, ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে জোট করে। কিন্তু ক্ষমতায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের মিত্রদের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে যেতে দেরি করে না।

সারকথা হলো, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলি আবারও তাদের এই খেলায় ইসলামী দলগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। যেমনটি তারা সবসময় করে আসছে। মুসলিমরা তাদের লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ হারাবে, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাবে না। আর দিনশেষে বাংলাদেশ শাসিত হবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায়। এটিই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

বাংলাদেশের মুসলিমরা আজ নিজেদেরকে এই অবস্থার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছে। দিগন্তে যখন কালো ঝড়ের অন্ধকার ও অশুভ মেঘ জড়ো হচ্ছে, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্ত বলয় শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে!

বিকল্প পথ:

এই আলোচনার শুরুতেই আমি বলেছি যে, আগত তুফান থেকে বাঁচতে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য কোনো একটি রাস্তা নির্ধারণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে রাস্তা কীভাবে, কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আবশ্যক হলো, প্রথমে আমরা বৈশ্বিক জিহাদের নেতৃবৃন্দের দেয়া দিক নির্দেশনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিবো এবং তাদের বর্ণনাকৃত কিছু উসুল ও মূলনীতি বুঝে নিবো।

আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী হুকুমত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংকল্পে প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই আন্দোলনটি মুসলিম ভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে:

১. অগ্রগামী/প্রাধান্য প্রাপ্ত এলাকা।

২. দ্বিতীয় স্তরের এলাকা বা অন্যান্য এলাকা।

প্রাধান্য প্রাপ্ত এলাকা হলো ঐসব এলাকা - যেখানে মুজাহিদদের পক্ষে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদের মোকাবেলা করা সম্ভব। যেখানে এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা যায়। কোন এলাকাকে প্রাধান্য প্রাপ্ত এলাকার প্রকারে গণ্য করার জন্য তাতে কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

শাইখ আবু বকর নাজী এর মতে সে বৈশিষ্ট্যগুলো হল[5]:

১. কৌশলগত সুবিধা থাকা। উঁচু-নিচু ও দুর্গম জায়গা অধিকৃত ও অধ্যুষিত অঞ্চল দখলে সহযোগী ও সমর্থক হবে।

---

[5] (The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass - Abu Bakr Naji – পৃষ্ঠা ৩৮)

২. শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা বিদ্যমান থাকা। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে দূরে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল থাকে। সীমান্তবর্তী না হয়ে কখনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও হতে পারে, বিশেষত যেসব অঞ্চল খুব ঘনবসতিপূর্ণ হয়।

৩. ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের ঢেউ থাকা। এলাকায় এর জন্য দাওয়াত ও আন্দোলন বিদ্যমান থাকা।

৪. সে এলাকার লোকদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো এলাকাকে অন্যান্য এলাকার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৫. ওই অঞ্চলের লোকদের হাতে হাতে অস্ত্র থাকা।

***

শাইখ আবু মুসআব আস সুরীও এধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন[6]। তিনি তার কিতাব 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ'তে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অঞ্চলের কিছু বৈশিষ্ট্যের তালিকা উল্লেখ করেছেন।

ভৌগোলিক পূর্বশর্ত:

এগুলো হচ্ছে ঐ অঞ্চলের বা ভূমির কাঠামোগত পূর্বশর্ত। এগুলো হচ্ছে -

১ – ভূমির প্রশস্ততা।

---

[6] دعوة المقاومة الإسلامية العالمية (THE GLOBAL ISLAMIC RESISTANCE CALL) – শাইখ আবু মুসআব আস সুরি – অধ্যায় ৮ – পৃষ্ঠা ২১

২ – বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘ সীমানার উপস্থিতি।

৩ – ভূমির প্রকৃতি এমন হতে হবে যা অবরোধ করা কঠিন।

৪ – আংশিক দুর্গম পার্বত্য এলাকা অথবা গহীন জঙ্গল অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা বেষ্টিত ভূমি থাকতে হবে। এই ধরণের ভূমি শত্রুদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধর জন্য জরুরি। সবচেয়ে উত্তম হয় যদি গাছপালায় আচ্ছাদিত পার্বত্য এলাকা থাকে।

৫ – এছাড়াও এমন ভূমি হওয়া প্রয়োজন যেন অবরোধের সম্মুখীন হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। ভৌগোলিক পূর্বশর্তঃ

জনসংখ্যাগত অবস্থা:

এই ভূমিতে বিশাল সংখ্যক অধিবাসীদের উপস্থিতি থাকলে ভালো। কারণ এর ফলে শত্রুপক্ষ চাইলেই মুজাহিদদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে না। আর মুজাহিদরাও জনবহুল গ্রাম্য এলাকাগুলোতে এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারবেন। এছাড়াও, এই এলাকার যুবকদের মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতা, জেদ, কোনো কিছু পিছনে লেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় – এই সকল গুণাবলীর উপস্থিতি থাকতে হবে। সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে ওই এলাকায় অস্ত্র সহজলভ্য হতে হবে।

১. এই ভূমিতে বিশাল সংখ্যক অধিবাসীদের উপস্থিতি থাকলে ভালো। কারণ এর ফলে শত্রুপক্ষ চাইলেই বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে না। আর বিপ্লবীরাও জনবহুল গ্রাম্য

এলাকাগুলোতে এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারবে।

২. যুবকদের মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতা, জেদ , কোন কিছু পিছনে লেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় – এই সকল গুণাবলীর উপস্থিতি থাকতে হবে।

৩. সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে ওই এলাকায় অস্ত্র সহজলভ্য হতে হবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ

এই ভূমিতে এমন একটা রাজনৈতিক পরিবেশ থাকতে হবে যেন সেখানকার অধিবাসীরা সহজেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রতিরোধ শুরু করতে হলে এমন একটা সময়ে এমন একটা বিষয় নিয়ে করতে হবে যেন সেখানকার মুসলিম উম্মাহকে সচল করতে সক্ষম হয়।

***

এই বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলো ছাড়া এমনিতেই শক্তিশালী বড়ো কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ীভাবে যুদ্ধ, জিহাদ জারি রাখা অনেক কঠিন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, সোমালিয়া, ইয়েমেন, চেচনিয়া, ইসলামী মরক্কোর কিছু এলাকা - এসবগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। তবে মিসর ও তিউনিসিয়ার মতো এলাকাগুলো এই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই

এগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই বণ্টন অনুযায়ী বাংলাদেশও দ্বিতীয় পর্যায়ের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা বাংলাদেশও এমন সব বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত যা প্রাধান্য প্রাপ্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য। যেমন, প্রথমত অসমতল ভূমি। সেইসাথে এখানে হাতিয়ারও সহজলভ্য নয়।

সারকথা হলো; বাংলাদেশ গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেয়ার চেষ্টা করা অনর্থক। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনও কল্যাণ কামনা করা মুসলিমদের জন্য শুধু অনর্থক নয়, বরং শরীয়ত পরিপন্থীও বটে।

আমরা এটাও দেখেছি যে, রাস্তা বা সাধারণ জনগণের সমাবেশে সশস্ত্র আগ্রাসন চালানো, খুন খারাবি করা এবং সরকারের মসনদ উল্টে দেয়ার চেষ্টা করাটাও - সেই পরিবর্তন আনবে না, যেটা আমাদের দরকার। এই বিষয়ে শাইখ সাইফ আল আদেল হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন:

“বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা। শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অর্থনীতি, সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাতে পরিপূর্ণভাবে মূলগত পরিবর্তন নিয়ে আসার নাম ‘বিপ্লব’। পূর্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে খতম করে নতুন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রতিষ্ঠা করাকে বিপ্লব বলে। অর্থাৎ সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে পরিপূর্ণ ভাবে

পরিবর্তন করে দেয়া। আর বিপরীতে সংস্কার (পুনর্গঠন) অর্থ হল পূর্বের ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনা।

আগে থেকেই থাকা শাসন ব্যবস্থা, তার পথ পদ্ধতি ও নিদর্শনাবলি সংস্কারবাদী বিপ্লব দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। বিপ্লব তো মূলগত পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে হয়, সংস্কার বা সংশোধনের উপর ভিত্তি করে নয়[7]।”

সুতরাং কুফরী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে হটিয়ে সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা - একটি বিপ্লবী পরিবর্তন। এটা শুধু সংস্কার ও সংশোধন নয়। তাই শুধু সরকার পরিবর্তনের দ্বারা এমন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের মুসলিমদের কর্মক্ষেত্র কী হবে?

পিছনের আলোচনার আলোকে প্রশ্ন আসে যে, বাংলাদেশের মুসলিমদের কর্মক্ষেত্র কী হবে? ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাওয়া ধর্মনিরপেক্ষ আগ্রাসন তারা কীভাবে মোকাবেলা করবে? আর যদি রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি অর্জনের সুযোগ এসে যায় অথবা ব্যাপক আকারে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম ছড়িয়ে পড়ে তখন এই প্রেক্ষাপটে তারা কী করবে?

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর দেয়ার দাবি রাখে। এবং এটি এমন প্রশ্নও বটে যার উত্তর দেয়া সহজ নয়। এই সমস্যার

[7] একটি বিপ্লব নির্দেশিকা || বিপ্লবের রূপরেখা - মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যায়দান, পৃষ্ঠা - ৬। লিঙ্ক - http://gazwah.net/?p=37775

কোনো জাদুকরী সমাধানও নেই। যেসব সমাধান বাস্তব নির্ভর ও কার্যকরী - সেগুলো অনেক দীর্ঘ সময়, পরিশ্রম ও জনবলের দাবি রাখে। এর জন্য ধৈর্য এবং দৃঢ়তা প্রয়োজন।

শাইখ আবু বকর নাজী তাঁর কিতাবে লিখেছেন:

কখনও কখনও এমন হয় যে, কোনো সরকারের হঠাৎ পতন হয়ে যায়, অথবা প্রাধান্য প্রাপ্ত এলাকা নয় এমন কোথাও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে অনিয়ম ছড়িয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় দুইটা সম্ভাবনা থাকে; হয়তোবা সেখানে কোনো ইসলামী সংগঠন থাকবে, যারা (সৃষ্ট) প্রেক্ষাপটকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগিয়ে অবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিবে। এমন হলে তারা নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে।

আর যদি সেখানে ইসলামী কোনো সংগঠন না থাকে তবে সে এলাকা খুব দ্রুত অনৈসলামিক কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অথবা সরকার পতনের পর তার যতটুকু অংশ অবশিষ্ট থাকবে, তাদের হাতেই আবার ক্ষমতা চলে যাবে। অথবা সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা চলে যাবে।[8]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শক্তিশালী কোনো ইসলামী সংগঠনের অনুপস্থিতিতে যদি শক্তি অর্জনের কোনো সুযোগ এসেও যায়, তবুও মুসলিমরা এই অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়া বা একে

---

[8] إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة - The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass - Abu Bakr Naji

নিয়ন্ত্রণে নেয়ার মত অবস্থানে থাকে না। এই ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হতে দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত শক্তি থাকা একটি মৌলিক এবং আবশ্যকীয় শর্ত। এই কথাকে বুঝা এবং একে সঠিকভাবে অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বাংলাদেশের মত অঞ্চলে যেকোনও ধরনের পরিবর্তন আনার জন্য আবশ্যক হলো তাওহীদ, দাওয়াত ও জিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দৃঢ় ও স্বাধীন ইসলামী আন্দোলন। যে আন্দোলন আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবে। যে আন্দোলন সমাজের মন্দগুলোকে দূর করবে, সমাজে ছড়িয়ে পড়া অন্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী শিক্ষাকে ব্যাপক করবে। এসব অন্যায় ও অশ্লীলতার চিকিৎসা ইসলাম কীভাবে করে - তা জনসম্মুখে বর্ণনা করবে। এমন এক আন্দোলন লাগবে যা গণতন্ত্র ও মানব রচিত অন্যান্য মতাদর্শগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করে তা রুখে দিবে এবং এই সবের উপর ইসলামের মর্যাদা ও বড়ত্ত্বের বিষয়ের জানান দিবে। এমন এক আন্দোলন যা শুধু মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রচার করবে না, বরং বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দিবে।

এমন এক আন্দোলন যা ঘোষণা দিয়ে হকের সঙ্গ দিবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। তারা মানুষের সামনে তাওহীদ ও শিরক, ঈমান ও কুফর, ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দিবে। তারা 'জাতীয়তাবাদ' ও 'বাঙ্গালীয়ানা'র নামে ভারতীয় রুসুম-রেওয়াজের ধোঁকায় পতিত না

হয়ে নিজেদের অনুসারীদের ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষণের জন্য কাজ করবে। এমন এক আন্দোলন যাদের অন্তরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা উম্মাহর ফিকির থাকবে, কিন্তু তারা ভারত উপমহাদেশের ও বাংলাদেশের স্থানীয় অধিকারের প্রতিও গুরুত্ব দিবে। এমন এক আন্দোলন যাদের দৃষ্টি মানুষের বানানো সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই আন্দোলনকে তার নিজস্ব আকীদা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অনমনীয় ও আপসহীন হতে হবে।

শাইখ আবু বকর নাজী বলেন:

"মহাবিশ্বের নিয়ম অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই সরকারের ক্ষমতা দুটি উপায়ে পরিবর্তন বা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে:

১. সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে,

২. জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তিতে (আকীদা, বিশ্বাস বা অধিকারের উপর ভিত্তি করে নয়)। কারণ জুলুমের প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এমন একটি বিষয় - যা কাফের এবং ঈমানদারদের দ্বারা সমানভাবে প্রশংসিত হয়[9]।"

সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক হলো - ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী

---

[9] إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة - The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass - Abu Bakr Naji

সঠিক আকীদা ও সঠিক মূল্যবোধের উপর হতে হবে। এমন নয় যে, ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য দলগুলোর মত শুধু জনগণের সমর্থন ও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য - সামাজিক অবিচারের বিষয়ে মনোযোগী হবে।

বাংলাদেশের জন্য সামনে এই দুই অবস্থা। অর্থাৎ এখনকার মত চলতে থাকা অথবা ভবিষ্যতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হওয়া বা শক্তি অর্জনের সুযোগ এসে গেলে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। এজন্য প্রথম কাজ হলো - তাওহীদ, দাওয়াত ও জিহাদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আপসহীন সুদৃঢ় একটি ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা। এই ধরনের একটি আন্দোলন যদি একবার অস্তিত্বে এসে যায়, তবে তা পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার আগ্রাসন ও তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বিশেষ কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা শক্তি অর্জনের কোনো সুযোগ এসে যায় তবে সুদৃঢ় একটি আন্দোলন এ সুযোগ থেকে ব্যাপক আকারে উপকৃত হতে পারবে।

আমরা যদি এই উপসংহারগুলি গ্রহণ করি, তাহলে কীভাবে এই ধরনের আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে এবং কীভাবে এটি সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া যায় - সে সম্পর্কে আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

***